প্রাচ্য বাণী-মন্দির
সার্ব্বজনীন গ্রন্থমালা
দ্বিতীয় পুষ্প

জৈনগুরু মহাবীর

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা,
এম.এ., বি.এল., পিএচ. ডি., ডি. লিট্.

১৯৪৪

ভূমিকা

বাঙালা ভাষায় লিখিত জৈনগুরু মহাবীরের জীবনচরিত এই প্রথম প্রকাশিত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই পুস্তকে ভগবান মহাবীরের জীবন বৃত্তান্ত ও ধর্মোপদেশ অলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি সুবিখ্যাত জৈন নর-নারীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। আশাকরি এই পুস্তক পাঠকপাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।

৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা,
জুন ১৯৪৪

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবন

বৈশালীর নিকটস্থ কুণ্ডনগরে মহাবীরের জন্ম হয়। এই নগরটী জ্ঞাত্রি-ক্ষত্রিয়দিগের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। মহাবীরের অপর একটী নাম ছিল নিগ্রন্থ জ্ঞাত্রিপুত্র। নায়, নাত কিংবা জ্ঞাত্রি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছিল। তিনি বৈশালিক নামেও পরিচিত, কারণ তিনি বৈশালী নগরবাসী ছিলেন। তাঁহার অপর একটী নাম ছিল বৈদেহ কারণ তিনি বিদেহদত্তার পুত্র। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিবারের ধন এবং যশ বর্দ্ধিত হওয়ায় পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিলেন বর্দ্ধমান। তিনি জ্ঞাত্রিপুত্র, শাসন-নায়ক এবং বুদ্ধ বলিয়াও পরিচিত ছিলেন।

জ্ঞাত্রি ক্ষত্রিয়েরা বৈশালী, কুণ্ডগ্রাম এবং বানিয়গ্রামে বাস করিত। জৈন পুস্তক হইতে জানা যায় যে জ্ঞাত্রিকেরা পাপ কার্য করিত না, কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না, এবং মৎস্য ভক্ষণ করিত না।

মহাবীর কাশ্যপ গোত্রজ ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পুত্র। তাঁহার পিতার আরও দুইটি নাম ছিল শ্রেয়াংস এবং

যশাংস। তাঁহার মাতা ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলা নামে পরিচিতা। তাঁহার আরও দুইটী নাম ছিল বিদেহদত্তা ও প্রিয়কারিণী। তাঁহার মাতা বশিষ্ঠ গোত্রজা ছিলেন। বিদেহের রাজা চেটক মহাবীরের মাতুল ছিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতা পার্শ্বনাথের ধর্ম আচরণ করিতেন।

ত্রয়োদশ বর্ষে মহাবীর যশোদা নাম্নী একজন ক্ষত্রিয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। যশোদা কৌণ্ডিণ্য গোত্রজা ছিলেন। অনবদ্যা অথবা প্রিয়দর্শনা নামে মহাবীরের একটী কন্যা ছিল। ক্ষত্রিয় যমালির সহিত তাহার বিবাহ হয়।

ত্রিশ বৎসর বয়সে মহাবীরের পিতামাতা পরলোক গমন করেন। দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া তিনি তপস্যা ও ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। সর্বজ্ঞ হইয়া উত্তর ভারতে তিনি ত্রিশ বৎসর ধর্ম প্রচার করেন।

মহাবীর গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথমে তাঁহার উত্তরীয় ত্যাগ করেন নাই। পরিধেয় বস্ত্র তিনি পরে ত্যাগ করিয়া নগ্নাবস্থায় থাকিতেন।

মহাবীর কোনও গৃহস্থ বা স্ত্রীলোকের সংস্রবে আসেন নাই। অতিশয় পবিত্রভাবে তিনি জীবন যাপন করিতেন। দুঃখ ও কষ্ট তিনি স্থিরচিত্তে সহ্য করিতেন। অল্প সময়ের জন্য তিনি শয়ন করিতেন। কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতেন না। পার্থিব সুখভোগ তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের অধিক

কাল তিনি শীতল জল পান করেন নাই। অন্যের পাত্র হইতে কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, কারণ ইহার মধ্যে অনেক জীব আছে। অন্যের পরিধেয় বস্ত্র তিনি কখনও পরিধান করেন নাই।

অসভ্য লোকের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইলেও তিনি বিন্দুমাত্র রাগান্বিত হইতেন না এবং তৃষ্ণাশূন্য হইয়া কষ্ট সহ্য করিতেন।

বয়সে তিনি গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা বড় ছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্বে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। কাহারও কাহারও মতে গৌতম বুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্বে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধ ও দেবদত্তের মধ্যে যে কলহ ছিল তাহা মহাবীর জানিতেন।

বুদ্ধের সময়ে জৈন সম্প্রদায় শক্তিশালী ছিল। যখন মহাবীর ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, বৈশালী এবং বাণিজ্যগ্রামে তিনি চারিটী বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রাজগৃহ এবং নালন্দায় চৌদ্দটী, মিথিলায় ছয়টী, ভদ্রিকায় দুইটী, আলভিকায় একটী, প্রণিতভূমিতে একটী, শ্রাবস্তীতে একটী এবং পাবায় শেষ বর্ষাবাস অতিবাহিত করিয়া কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।

মহাবীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনও প্রভেদ রাখিতেন না। জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করেন নাই। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সমভিব্যাহারে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া-

ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে ধর্মপুস্তক (পূর্ব) ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন যদি কেহ প্রকৃত সুখলাভে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহাকে জীবহত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যাকথন এবং অসচ্চরিত্রতা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

মহাবীর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ছিলেন। তাঁহার ছিল অসীম জ্ঞান। তিনি কর্মবাদী ছিলেন। মানবের নিকট তিনি প্রচার করেন যে জন্ম কিছুই নহে, জাতি কিছুই নহে, কর্মই সর্বস্ব এবং কর্মের নিষ্পত্তির উপর ভবিষ্যৎ সুখ নির্ভর করে।

জৈন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে মহাবীর একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, সুপ্রসিদ্ধ নেতা, সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, সুপ্রসিদ্ধ তাপস ও সুপ্রসিদ্ধ পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুজ্ঞানসম্পন্ন সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি নিষ্কাম ও মুক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচার করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জ্ঞান, ধর্ম এবং বিশ্বাসের দ্বারা সমস্ত কর্মের ধ্বংস করিয়া তিনি উৎকর্ষ লাভ করেন। যাঁহারা নির্বাণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি একজন বীরপুরুষ—যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। তিনি আজীবন আত্মসংযম আচরণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত দার্শনিক তথ্য আয়ত্ত করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে মহাবীর সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বর্ণনা পাই যে তিনি একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তিনি বহুজনসম্মানিত ও বহুজ্ঞানসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ, এবং

অনেক দিন ধরিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। তিনি পাপমুক্ত ছিলেন।

তিনি বাহিরে নগ্ন ছিলেন এবং ভিতরে সমস্ত পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত ছিলেন। পাপ ও তৃষ্ণামুক্ত হইয়া তিনি ধ্যান করিতেন এবং অসাবধানতাবশতঃ কোনও কার্য করেন নাই। নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিয়া ভিক্ষা করিতেন। তিনি ছিলেন অল্পভাষী। অনন্ত, সম্পূর্ণ এবং বাধাবিপত্তিশূন্য জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীরকে নির্গ্রন্থ বলা হইত, কারণ তিনি বন্ধনমুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে গতাত্ম বলা হইত, কারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তাঁহার মন নিবিষ্ট ছিল। তাঁহাকে যতাত্ম বলিত, কারণ তিনি তাঁহার মনকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্থিতাত্ম বলা হইত, কারণ তাঁহার মন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাবীর ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ধর্মপ্রচারক। যে ধর্ম তিনি নিজে আচরণ করেন নাই, সে ধর্ম তিনি প্রচার করিতেন না। তাঁহার মতে দুঃখ, ত্যাগ, প্রেম ও দয়ার দ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়।

অহিংসাই পরম ধর্ম এবং এই ধর্মের তিনি প্রচারক ছিলেন। যাহারা তাঁহার ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল তাহারা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করিত না। তিনি সর্বদাই মানবকে চরিত্রবান হইতে শিক্ষা দিতেন।

বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের তিরোধান হয়।

তাঁহার ধর্ম যে কেবল ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে, সিংহল দ্বীপেও ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

মহাবীরের ধর্মের প্রভাব মানব জাতির উপর বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জৈন ভগবতী সূত্র হইতে জানা যায় যে মঙ্খলিপুত্র গোশাল মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য অতিশয় ইচ্ছুক হন। কিন্তু মহাবীর সর্বপ্রথম তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে সম্মত হন নাই। যখন তিনি পণিয়ভূমিতে বাস করিতেছিলেন গোশাল তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পুনরায় অনুরোধ করেন। এইবার মহাবীর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে গোশাল মহাবীরের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা হন। কাহারও কাহারও মতে মহাবীরের দুই বৎসর পূর্বে তিনি একজন ধর্মপ্রচারক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর ষোল বৎসর মহাবীর জীবিত ছিলেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—আনন্দ ও তাঁহার স্ত্রী শিবনন্দা, কামদেব ও তাঁহার সহধর্মিণী ভদ্রা, চূড়নিপ্রিয় এবং তাঁহার পত্নী শ্যামা, সুরদেব ও তাঁহার স্ত্রী ধন্যা, চুল্লশতক ও তাঁহার স্ত্রী বহুলা, কুন্দকোলিত ও তাঁহার স্ত্রী পুষ্যা, শ্রদ্ধালুপুত্র ও তাঁহার স্ত্রী অগ্নিমিত্রা, মহাশতক, নন্দিনীপ্রিয় ও তাঁহার সহধর্মিণী অশ্বিনী, খলতিপ্রিয় এবং তাঁহার পত্নী ফাল্গুনী, শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী মিগারের পুত্রবধূ বিশাখা, বালকগ্রামবাসী

উপালী, সম্রাট বিম্বিসারের পুত্র অভয় এবং লিচ্ছবি সৈনাধ্যক্ষ সিংহ। ইহা ব্যতীত তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে বিজয় এবং সুদর্শন নামে দুইজন ধনী গৃহস্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনগ্রন্থ উবাসগদসাও হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাবীরের সর্বপ্রথম শিষ্যদিগের মধ্যে উগ্র ও ভোগেরা সুবিখ্যাত ছিল।

দীর্ঘতপস্বী ও অগ্নিবেশ্যায়ন গোত্রজ সত্যক মহাবীরের ধর্মশিক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কল্পসূত্র মতে মহাবীরের জীবদ্দশায় তাঁহার ১৪০০০ শিষ্য ছিল এবং তাহাদের নেতা ছিল ইন্দ্রভূতি। ৩৬০০০ ভিক্ষুণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন চন্দনা। ১৬৯০০০ উপাসক ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শঙ্খশতক। ইহা ব্যতীত ৩১৮০০০ উপাসিকা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন সুলসা ও রেবতী।

কুরুরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দোত্তরা সর্ব্বপ্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বিণী হন। শ্রাবস্তীতে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্জুন মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে মহাবীরের শিষ্য হন।

বৃজিভূমিতেও মগধবাসীর মধ্যে মহাবীরের দানধর্ম প্রচারের ফলে বৈশালীর অনেক উচ্চপদস্থ লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মহাবীরের শিষ্যদিগের মধ্যে এগারজন গণধর ছিলেন। তাঁহারা নয়টী পৃথক নির্গ্রন্থ দলকে চালনা করিতেন। রায়-পসেনি নামক জৈন পুস্তকের মতে মহাবীরের কেশী নামক একজন শিষ্য ছিল।

ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি ও বায়ুভূতি নামে তিনজন জৈন ভিক্ষুর উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলে গৌতম গোত্রজ ছিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে ৫০০ জন ভিক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রজ আর্য্যব্যক্ত এবং অগ্নিবেশ্যায়ন গোত্রজ আর্য্যসুধর্ম প্রত্যেকে ৫০০ জন ভিক্ষুকে, বশিষ্ঠ গোত্রজ মণ্ডিকপুত্র এবং কাশ্যপগোত্রজ মৌর্য্যপুত্র প্রত্যেকে ২৫০ জন ভিক্ষুকে, গৌতম গোত্রজ আর্য্য অকম্পিত এবং হারিতায়ন গোত্রজ অচলভ্রাতৃ, কৌণ্ডিণ্য গোত্রজ সেতার্য্য এবং প্রভাস প্রত্যেকে ৩০০ জন ভিক্ষুকে ধর্মশিক্ষা দেন।

এগারজন গণধর একমাসব্যাপী অনশন ব্রত অবলম্বনের ফলে রাজগৃহে মারা যায়। মহাবীরের তিরোধানের পর ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম ভবলীলা সংবরণ করেন। ভিক্ষু এবং উপাসকের মধ্যে ভেদাভেদ স্থাপনের জন্য মহাবীর ইন্দ্রভূতিকে ভৎসনা করেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাবীরের শিষ্যেরা লোহিতবর্ণবিশিষ্ট ও একবস্ত্রধারী ছিলেন।

জৈনদিগের মতে খৃঃ পূঃ ৫২৭ সালে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধদিগের মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ কিংবা ৫৪৩ সালে বুদ্ধের তিরোধান হয়। যদি আমরা ইহা স্বীকার করি তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই দুইজন প্রথিতযশা ধর্মপ্রচারকের জীবনের বহু ঘটনার সহিত এই দুইটী তারিখের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। বুদ্ধের পাঁচ কিংবা ছয়, সাত কিংবা আট, কিংবা

এমন কী চৌদ্দ পনের বৎসর পূর্বে মহাবীর দেহত্যাগ করেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্বে মহাবীর জিন হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে খৃঃ পূঃ ৪৮৬ কিংবা ৪৮৪ সালে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন এবং খৃঃ পূঃ ৫৪৪ কিংবা ৫৪৩ সাল বুদ্ধের পরিনির্বাণের তারিখ বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। খৃঃ পূঃ ৫২৭ সালে মহাবীর জিনত্ব প্রাপ্ত হন এবং যদি আমরা এই তারিখটী ঠিক বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ৫৭০ সালে মহাবীরের জন্ম হয় এবং খৃঃ পূঃ ৪৯৮ সালে তিনি ভবলীলা সংবরণ করেন।

মহাবীর পূর্বভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ জাতিদিগের সহিত জ্ঞাত্রিকদিগের নিকটসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে ধর্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন বহুসংখ্যক ভারতবাসী আজ সেই ধর্মাবলম্বী।

একটী বৌদ্ধসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের নিকট পাবার শ্রামণের চুন্দ মহাবীরের তিরোধানের সংবাদ আনয়ন করেন এবং আনন্দ বলেন যে এই সংবাদটী ভগবান বুদ্ধকে দেওয়া প্রয়োজন।

মল্লেরা মহাবীরের ভক্ত ছিল। জৈন কল্পসূত্র হইতে জানা যায় যে নয়জন মল্লরাজা মহাবীরের মহাপ্রয়াণের উৎসব দিবসে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানবর্তিকা নির্বাপিত হইয়াছে সত্য, এখন আমরা পার্থিব প্রদীপ প্রজ্বলিত করিব"।

যখন মহাবীর তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন, তখন বিম্বিসার

মগধের ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং অঙ্গদেশ মগধরাজ্যভুক্ত ছিল। বৈশালীর বৃজি-লিচ্ছবীগণ এবং কুশীনারা ও পাবার মল্লেরা দুইটি ক্ষমতাশালী সঙ্ঘ স্থাপন করেন। প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলের রাজা এবং কাশী কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুদ্ধ ও মহাবীর উত্তর ভারতের দুইটী প্রধান জাতিভুক্ত এবং উভয়েই কর্মবাদী ছিলেন।

মহাবীরের মতে, (১) ভিক্ষু সারাজীবন অরণ্যে বাস করিবেন; (২) তিনি তাঁহার জীবন ধারণের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষান্নের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন; (৩) তিনি পুরাতন এবং জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিবেন; (৪) তিনি বৃক্ষতলে বাস কবিবেন, গৃহে নহে; এবং (৫) তিনি মৎস বা মাংস ভক্ষণ পরিহার করিবেন।

মহাবীর দিবারাত্র ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তিনি বিশেষ ভাবে সংযমী ছিলেন এবং সকল প্রকার দুঃখকষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেন। মহাবীরের সাধারণ শিষ্যেরা ধনী ছিল এবং তাহারা তাঁহাকে সকল বিষয়ে পরামর্শ করিত।

মহাবীরের নির্বাণের নয় শত বৎসর পরে তাঁহার অমূল্য বাণী গ্রন্থভুক্ত করিবার জন্য দেবর্দ্ধির সভাপতিত্বে বলভিতে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত জৈন আগম কিংবা সিদ্ধান্ত হইতে তৎকালীন বহু বিষয় আমরা জানিতে পারি। মহাবীর সেকালের চলিত কথার উন্নতি-কল্পে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা মধ্যযুগের

ভারতবর্ষের সকল প্রকার প্রাকৃত ভাষার উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের যে সকল দেশে মহাবীর বিচরণ করেন, সেগুলি আজ তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। সেই সকল স্থানে জৈনদিগের বহু মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং এই মন্দিরগুলি কলা ও স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপদেশ

জৈন আগমে মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ করা আছে। ইহা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত। ইহার পূর্ব্বে কোন জৈনগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁহার উপদেশগুলি জনশ্রুতিরূপে চলিয়া আসিতেছিল।

পালিনিকায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাবীর তাঁহার সমসাময়িকদিগের নিকট নিগণ্ঠ জ্ঞাতৃপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। বহু নরনারী তাঁহার সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তিনি শ্রেষ্ঠতম মানবধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আদর্শজীবনের গতিবিধি তাহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল। মহাবীর তাঁহার শিষ্যগণকে জীবনে ধীর ও স্থির থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশগুলি তাহারা সাগ্রহে পালন করিত। তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দেশ্য—সুখলাভ। এই সুখ পার্থিব সুখের মধ্য দিয়া লাভ হয় না; দুঃখের মধ্য দিয়াই লাভ করিতে হয়।

জৈন-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ লাভ করা। নির্ব্বান

শব্দের অর্থ মোক্ষ অথবা মুক্তি। মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আপনাকে সকল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। মহাবীরের শিষ্য গৌতম পার্শ্বের শিষ্য কেশীকে বলিয়াছিলেন, "যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, কষ্ট নাই, ব্যাধি নাই, এইরূপ একটী নিরাপদ স্থান প্রত্যেকের লাভ করা কর্ত্তব্য। ইহাকেই নির্ব্বাণ বলা হয়। এই স্থান নিরাপদ, সুখময় এবং শান্তিপূর্ণ।" মোক্ষ বলিতে কর্ম্মজনিত বন্ধন হইতে মোক্ষ বুঝায়। মুক্তি বলিতে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্তি বুঝায়।

নির্ব্বাণ বলিতে সুখের প্রকৃত অবস্থা বুঝায়। পার্থিব সুখের মধ্য দিয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

জৈনরা দুর্গম এবং দুঃখময় পথাবলম্বন করিয়া মুক্তি অথবা নির্ব্বাণলাভের পথে অগ্রসর হয়। দুর্গম এবং দুঃখপূর্ণ পথ বলিতে কঠোর তপস্যা বুঝায়। দেহ, মন এবং বাক্য সম্বন্ধে সম্বর অথবা আত্ম-সংযম আচরণ করাই কঠোর তপস্যা। তপস্যার দ্বারা পুরাতন কর্ম্মের ধ্বংস করিলে এবং নূতন কর্ম্মের সঞ্চয় না করিলে সংসারে পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ইহার ফলে সমস্ত কর্ম্মের ধ্বংস হইবে। তাহাতে সকল দুঃখের ক্ষয় হইবে। ইহার ফলে বেদনার ধ্বংস হইবে। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক সকল দুঃখকষ্টের অবসান হইবে।

আত্মার তিনটি অবস্থা, এই তিনটি শব্দের দ্বারা সূচিত হয়—জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র। জৈন ধর্ম্মের প্রধান বিষয়গুলি নবতত্ত্বের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১।	জীব	৬।	আশ্রব
২।	অজীব	৭।	সম্বর
৩।	বন্ধ	৮।	কর্ম্মক্ষয়
৪।	পুণ্য	৯।	মোক্ষ
৫।	পাপ		

ইহার মধ্যে পাঁচটি অস্তিকায় আলোচিত হইয়াছে ঃ—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ, এবং আত্মা।

দ্রব্য, গুণ এবং পর্য্যায়—ইহারা এই পাঁচটী অস্তিকায়ের অন্তর্গত।

স্যাদ্বাদ

ইহা কতকগুলি "ন"য়ের সমন্বয়। সূত্রকৃতাঙ্গে স্যাদ্বাদ শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীর ও বুদ্ধ সঞ্জয়ের সর্ব্ববিষয়ের সত্তা সম্বন্ধে সংশয়বাদ সমর্থন করেন নাই। এই জগৎ বিনশ্বর, কি অবিনশ্বর—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর বলেন, "যাহারা এই জগতের স্থায়িত্ব সমর্থন করে, অথবা যাহারা এই জগতের অস্থায়িত্ব সমর্থন করে, তাহাদের কাহারও পক্ষাবলম্বন করা উচিত নহে। এই দুইটী মতের কোনটীই সত্য-সন্ধানের সহায় নয়। ইহারা মানবকে ভ্রমপথে চালিত করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান স্যাদ্বাদের মধ্যে পাওয়া যায়। সামান্য জগতের দিক দিয়া এই জগৎ অবিনশ্বর। পরিবর্ত্তনশীলতার দিক দিয়া এই জগৎ বিনশ্বর"।

ক্রিয়াবাদ

জৈনধর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়াবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। মহাবীরের শিক্ষার মধ্যে অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদ হইতে ক্রিয়াবাদের পার্থক্য কি তাহা দেখান হইয়াছে। পালিনিকায়ের মধ্যে মহাবীরের সমসাময়িক চারিজন শিক্ষকের অক্রিয়াবাদ সম্বন্ধে কি মত ছিল তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই চারিজন শিক্ষকের নাম—পূরণ কাশ্যপ, মক্করি গোশাল, ককুধ কাত্যায়ন এবং অজিত কেশকম্বলী। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন নিষ্ক্রিয়বাদী, দ্বিতীয় ব্যক্তি অদৃষ্টবাদী, তৃতীয় ব্যক্তি অবিনশ্বরবাদী এবং চতুর্থ ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

সূত্রকৃতাঙ্গে অক্রিয়াবাদের মূলনীতির এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—

(১) এই পৃথিবীতে পাঁচটী উপাদান আছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ইহাদের সমষ্টি হইতে আত্মার উদ্ভব। ইহাদের ধ্বংস হইলে প্রাণিগণের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

প্রত্যেক লোকেরই একটী ব্যক্তিগত আত্মা আছে। যত দিন দেহ থাকে, তত দিন আত্মা থাকে। দেহের বিনাশ হইলে আত্মার বিনাশ হয়। আত্মার পুনর্জন্ম হয় না।

পাপপুণ্য বলিয়া এ জগতে কিছু নাই। পরজগৎ বলিয়াও কিছু নাই। দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

(২) কোন লোক যখন স্বয়ং কার্য্য করে, অথবা অপরের দ্বারায় কার্য্য করায়, তখন তাহার আত্মা কোন কিছু করে না বা করায় না।

(৩) এই জগতে পাঁচটী পদার্থ আছে এবং আত্মা একটী ষষ্ঠ পদার্থ। এই ছয়টী পদার্থ অবিনশ্বর।

(৪) সুখ, দুঃখ এবং পরমানন্দ সমষ্টিগত আত্মার দ্বারা লব্ধ হয় না; ব্যক্তিগত আত্মার দ্বারা অনুভূত হয়।

(৫) দেবতার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং শাসিত হইতেছে। বিশৃঙ্খলা হইতে ইহার উৎপত্তি।

(৬) এই জগৎ অনন্ত এবং অসীম। অনন্তকাল হইতে ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহার বিনাশ নাই।

(৭) পৃথিবী যেমন এক হইয়াও বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মা এক বস্তু হইলেও বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়।

এই সকল মত চারিটী মতে রূপান্তরিত হইয়াছে, যথা—নিরীশ্বরবাদ, অবিনশ্বরবাদ, নিষ্ক্রিয়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদ।

নিরীশ্বরবাদ

আত্মা একটী জীবন্ত পদার্থ। যত দিন দেহ থাকে, তত দিন আত্মা থাকে। দেহের ধ্বংস হইলে আত্মা থাকে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ হয়। দেহ ভিন্ন মানবের অস্তিত্ব নাই। যাহারা ইহা বিশ্বাস করে তাহারা সত্য কথা বলে।

অবিনশ্বরবাদ

পঞ্চভূত ও আত্মা, এই ছয়টী পদার্থ অসৃষ্ট। ইহাদের আদি

বা অন্ত নাই। সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া ইহারা ফলাফল নির্ণয় করে। ইহারা অবিনশ্বর। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহার বিনাশ নাই।

নিষ্ক্রিয়াবাদ

সমস্ত বস্তুর মূলে আত্মা আছে। আত্মার দ্বারাই ইহারা উৎপন্ন হয়। আত্মার দ্বারাই ইহারা প্রকাশিত হয়। আত্মার সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আত্মার মধ্যেই ইহারা আবদ্ধ। যেমন জলবুদ্বুদ জলেই উৎপন্ন হয়, জলেই বর্দ্ধিত হয়, জল হইতে বিছিন্ন হয় না, জলেই সীমাবদ্ধ—সেইরূপ সকল বস্তুই আত্মার সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

অদৃষ্টবাদ

কোন কোন লোক কর্ম্ম স্বীকার করে। আবার কোন কোন লোক কর্ম্ম স্বীকার করে না। উভয় লোকই একরূপ, তাহাদের অবস্থা একরূপ, কারণ তাহারা একই বিধান অর্থাৎ অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রণে কি স্থাবর, কি অস্থাবর, সকল প্রাণীকেই দেহলাভ করিতে হয়, জীবনের নানা বিপর্য্যয় সহ্য করিতে হয় এবং সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয়।

এইগুলি অক্রিয়াবাদের দৃষ্টান্ত। ইহা হইতেই নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয় না এবং ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দীপনা আসে না।

অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, অজ্ঞান-

বাদীরা সত্য এবং জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যখন তাহারা দুইটী বিরুদ্ধ মতের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা দুইটী মতই বর্জ্জন করে। জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতাই অজ্ঞানবাদের প্রকৃত পরিণাম। বিনয়বাদীরা বলেন, ব্রতনিয়মাদি পালন করিলে ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য লাভ হয়। কেহ কেহ বলেন, লবণ ব্যবহার না করিলে উৎকর্ষ লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিলে উৎকর্ষ লাভ হয়।

জৈন ধর্ম্মের সহিত এই দুই প্রকার ক্রিয়াবাদের সামঞ্জস্য নাই।

(১) যাহার আত্মা পবিত্র, তিনি কৈবল্য লাভ করিয়া মন্দ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবেন ; কিন্তু প্রীতিকর উত্তেজনা অথবা ঘৃণার মধ্য দিয়া ইহা পুনরায় কলুষিত হইবে। যেমন স্বচ্ছ জল কলুষ হইতে মুক্ত হইয়াও পুনরায় কলুষিত হয়, সেইরূপ আত্মাও কলুষিত হয়।

(২) যদি কোন লোক শিশু-হত্যার উদ্দেশ্য লইয়া কোন একটী কুমড়াকে শিশু মনে করিয়া বলি দেয়, তাহা হইলে সে হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন লোক কুমড়া ভাজিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন একটী শিশুকে কুমড়া মনে করিয়া ভাজে, তাহা হইলে সে হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবে না।

মহাবীরের ক্রিয়াবাদের মূলনীতি এইরূপ :—স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারাই মানবের দুঃখোদ্ভব হয়। এই দুঃখের অন্য কোন কারণ

নাই। সুখ ও দুঃখ মানবের কর্ম্মফল। মানুষ একাকী জন্মে, একাকী মরে, একাকী উঠে, একাকী পড়ে। তাহার চেতনা, ধারণা, রাগ, বুদ্ধি, অনুভূতি, সমস্তই ব্যক্তিগত। আত্মীয়তার বন্ধন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

সমস্ত প্রাণীই স্বকৃত কর্ম্মের জন্য বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন।

পাপীরা নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মের ধ্বংস করিতে পারে না। ধার্ম্মিকেরা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কর্ম্মের বিলোপ সাধন করে।

প্রীতিকর বস্তু প্রীতিকর বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করে কিন্তু স্বয়ং তাহা করে না, এবং যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করে, ইহারা উভয়েই ঈষৎ দোষে দুষ্ট হইবে।

যে ব্যক্তি নিজেকে এবং জগৎকে জানে, যে প্রাণীরা কোথায় যায় এবং কোথা হইতে আর ফিরে না জানে, যে কি স্থায়ী এবং কি অস্থায়ী জানে, যে জন্ম, মৃত্যু এবং মানবের ভবিষ্যৎ জানে, যে নরকবাসীদের যন্ত্রণা জানে, যে পাপের প্রবাহ এবং ইহার বিরতি জানে, যে দুঃখ এবং ইহার ধ্বংস জানে, সেই ক্রিয়াবাদ প্রচার করিবার যোগ্য।

ক্রিয়াবাদ বলিতে আত্মা ও কর্ম্মের পদ্ধতি বুঝায়। যে সকল কাজ (ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত) আত্মার উপর ক্রিয়া করে তাহাই কর্ম্ম। যদি কোন লোক কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির

জন্য এমন কোন কাজ করে যদ্দ্বারা তাহার আত্মা আহত অথবা বিচলিত হয় না, তাহা হইলে তাহার আত্মা যে নিষ্ক্রিয়, একথা বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মের প্রভাববশতঃ আত্মাকে উপলব্ধি করিতেই হইবে। আত্মার উপর ব্যক্তিগত ক্রিয়ার পরিণতিকে 'লেসা' অথবা 'লেশ্যা' বলা হয়। 'লেসা' শব্দটীর অর্থ রঙ। প্রাণীদিগকে ছয়টী রঙের অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। বস্ত্র যেমন বিভিন্ন রঙের দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেইরূপ মনও পাপের দ্বারা কলুষিত হয়। সেইজন্য জৈনরা পবিত্র লেশ্যা লাভের জন্য চেষ্টা করিত।

জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্র

জ্ঞান, বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম—এই তিনটী জৈনধর্ম্মের শিক্ষণীয় বিষয়। জ্ঞান বলিতে সম্যক্ জ্ঞান, বিশ্বাস বলিতে সম্যক্ বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম বলিতে সম্যক্ ধর্ম্ম বুঝায়। এই তিনটী কৈবল্য, মোক্ষ এবং নির্ব্বাণ লাভের সহায়ক।

উত্তরাধ্যয়নসূত্রে পাঁচ প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে :—(১) শ্রুত জ্ঞান অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয় ; (২) অভিনিবোধিক জ্ঞান অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, চিন্তাশক্তি অথবা উপলব্ধি হইতে যে জ্ঞান লাভ হয় ; (৩) অবধি জ্ঞান অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে অতিন্দ্রিয় জ্ঞান ; (৪) মনঃপর্য্যায় জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান অপরের মনের গতি আলোচনা করিয়া লাভ হয় ; এবং (৫) কেবল জ্ঞান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম অসীম জ্ঞান।

অবধি জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর সহিত সহব্যাপী, অপ্রাকৃত জ্ঞানের সহিত বিজড়িত নয়। কল্পসূত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—"তিনি অবধি জ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জম্বুদ্বীপ দেখিতে পাইতেন।" এখানে 'অবধি' শব্দের অর্থ 'যাহা বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ, যাহা পর্য্যবেক্ষণীয় বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ।'

আচারাঙ্গ সূত্রে মনঃপর্য্যায় জ্ঞানের অর্থ সমস্ত সচেতন প্রাণীর চিন্তাধারা হইতে লব্ধ জ্ঞান। কেবল জ্ঞানের অর্থ যে জ্ঞান মানবকে সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে ; দেব, দানব ও নরলোকের সমস্ত অবস্থা জানিতে সহায়তা করে।

অঙ্গ এবং অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে জ্ঞান বলিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি অথবা জ্ঞান বুঝায়।

সম্যক্ দর্শন বলিতে সত্যের তাৎপর্য্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি, ধর্ম্মোৎকর্ষের মানসিক উপলব্ধি, ধর্ম্মপ্রচারকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, এবং আত্ম-পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিশ্বাস-বস্তু গ্রহণ বুঝায়। মন হইতে সমস্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিয়া দেওয়া এবং বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা—ইহাই সম্যক্ দর্শনের উদ্দেশ্য। এই বিশ্বাসপ্রবণতা জীবনের উৎকর্ষ সাধনের একটী নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া কর্ম্মে প্রেরণা আনয়ন করে।

ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন এই কয়টী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—ধর্ম্মমতের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় না থাকা, অপরের ধর্ম্মমতের প্রতি অধিক অনুরাগ না থাকা, স্বধর্ম্মের মুক্তিদায়ক গুণ সম্বন্ধে

সন্দেহ না করা, মোহমুগ্ধ না হওয়া, ধার্ম্মিকগণের প্রশংসা করা, দুর্ব্বলদিগকে উৎসাহিত করা, ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগকে ভালবাসা ও সমর্থন করা, এবং স্বধর্ম্মমতকে উচ্চ স্থান দেওয়া।

যিনি জ্ঞানী তিনি বিশ্বাসী এবং যিনি বিশ্বাসী তিনি কর্ম্মী! সৎচরিত্রের মধ্যেই ধর্ম্ম নিহিত। সম্যক্ বিশ্বাস ভিন্ন সম্যক্ চরিত্র গঠিত হইতে পারে না এবং সম্যক্ সত্যোপলব্ধি ভিন্ন সম্যক্ বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। সম্যক্ চরিত্র বলিতে নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধতা বুঝায়। দৈহিক সংযম, মানসিক সংযম এবং বাচনিক সংযম ; এই তিন প্রকার সংযমের দ্বারা এই বিশুদ্ধতা লাভ করিতে হয়। সমস্ত পাপ বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মের প্রথম সোপানে আরোহণ করা যায়। পাপ অনেক প্রকারে সংঘটিত হয়, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, দৈহিক কার্য্যের দ্বারা, অথবা বাক্যের দ্বারা, অথবা চিন্তার দ্বারা। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে সমিতি এবং গুপ্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে। জীবহত্যা না করা, নির্লোভ হইয়া এবং চরিত্রের নিয়মানুসারে জীবন যাপন করা, শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলের প্রতি যত্নবান্ হওয়া, ভ্রমণে, উপবেশনে, শয়নে এবং খাদ্যাদি গ্রহণে আত্ম-সংযম আচরণ করা, গর্ব্ব, ক্রোধ, শঠতা এবং লোভ পরিহার করা, সমিতি লাভ করা, পাঁচটী সম্বরের দ্বারা আত্মরক্ষা করা এবং অসংখ্য বন্ধনের ভিতর বন্ধনমুক্ত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করা—এই কয়টী সম্যক্ চরিত্রের মূলনীতি।

নয়টী তত্ত্বের তাৎপর্য্য

সম্যক্ জ্ঞান, বিশ্বাস ও চরিত্র মহাবীরের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। জৈনধর্ম্মের এই পথ অবলম্বন করিলে কর্ম্মের ধ্বংস হয় এবং সিদ্ধিলাভ হয়। এই তুইটী বিষয় বুঝাইবার জন্য নবতত্ত্বের অথবা নয়টী শব্দের অবতারণা করা হইয়াছে।

জীব ও অজীব

জীব শব্দের অর্থ যাহাদের জীবন আছে এবং অজীব শব্দের অর্থ যাহাদের জীবন নাই। ছয়টী শ্রেণীর সজীব পদার্থ এবং সত্তা লইয়া জীবন-জগৎ সৃষ্ট।

'জীব'তত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে সকল প্রাণীই সুখলাভ করিতে ইচ্ছুক। জীবের অনিষ্ট করিয়া মানব স্বীয় আত্মার অনিষ্ট করে। এইজন্য তাহাকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ হউক, অথবা নীচ হউক, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর অধীন। প্রতি জন্মের পাপকর্ম্ম হেতু তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

প্রাণহীন পদার্থ আকৃতিবিশিষ্ট অথবা আকৃতিবিহীন। জড়-পদার্থ লইয়া আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ গঠিত। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্থান এবং কাল, এই চারিটী অস্তিকায় লইয়া আকৃতিবিহীন পদার্থ গঠিত। 'অজীব'তত্ত্ব আলোচনা করিলে জীব জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়।

বন্ধ

বন্ধ বলিতে আত্মার বন্ধন বুঝায়। জন্ম ও মৃত্যু, জরা ও নাশ, সুখ ও দুঃখ এবং কর্ম্মকৃত অন্যান্য ভাগ্য-বিপর্য্যয়—ইহাদের সহিত আত্মার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন তাহাই বন্ধ।

পুণ্য ও পাপ

পুণ্য ও পাপ বলিতে যে সকল পুণ্য এবং পাপকর্ম্ম আত্মাকে জন্ম ও মৃত্যুচক্রে আবদ্ধ করে তাহাকে বুঝায়।

আশ্রব

আশ্রব বলিতে যাহা আত্মাকে পাপের দ্বারা অভিভূত করায় তাহাকে বুঝায়।

সম্বর

সম্বর বলিতে যে আত্ম-সংযম আচরণ করিলে পাপের গতিরোধ তাহাকে বুঝায়।

নির্জরা

নির্জরা বলিতে তপশ্চরণের দ্বারা আত্মার উপর কর্ম্মের সঞ্চিত ফল দূরীভূত করা বুঝায়।

মোক্ষ

মোক্ষ বলিতে কর্ম্ম এবং পাপের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি বুঝায়।

সিদ্ধি

সিদ্ধি বলিতে মোক্ষ অথবা মুক্তি বুঝায়।

জগতের অন্ধকারময় দৃশ্য

মহাবীরের মতে এই জগৎ তমসাচ্ছন্ন। পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও তাহাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আত্মাকে অতিক্রম করিতে হয়। সংসার ও মৃত্যু অব্যাহত বন্যাস্রোতের অনুরূপ। ক্ষিতি, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রত্যেকেরই জীবন আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। অনুরাগ, কাম ও আসক্তির জন্য মানবকে কর্ম্ম করিতে হয়। এই জগতে দ্বন্দ্ব, কলহ, মৃত্যু, জীবহত্যা প্রতিনিয়তই সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহার ফলে গভীর নৈরাশ্য আসিয়া জীবনে ছায়াপাত করে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, রমণী এবং অর্থের জন্য মানবকে নানাপ্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ইহার ফলে আত্মা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। শব্দ, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া সমস্ত প্রাণীকে কষ্টভোগ করিতে হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়সুখের পথ জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর পথ। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া মানবের শান্তি অথবা সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

জগতের উজ্জ্বল দৃশ্য

জগতের অন্ধকারময় চিত্রের পার্শ্বেই ইহার জাজ্জ্বল্যমান চিত্র বর্ত্তমান। মহাবীরের ধর্ম্মবাণী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আত্মা জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্তা এবং নির্ব্বাণ আত্মার চিরন্তন

শান্তিপূর্ণ অবস্থা। মানব কঠোর সৎচেষ্টার দ্বারা ইহজীবনেই আত্মার এই শাশ্বত অবস্থা লাভ করিতে পারে। ষ্টিভেনসনের মতে জৈনধর্ম্মের অন্তর শূন্য। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। নীচবৃত্তি দূরীভূত হইলে অন্তরের মধ্যে প্রেম, দয়া, নম্রতা, অকপটতা এবং চরিত্রের অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশ লাভ করে। জৈনদের পবিত্রতা, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শ্বেতপদ্ম।

মহাবীরের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার

মহাবীরের মতে পাঁচটী মহাব্রত দ্বারা আত্মার শান্তিপূর্ণ অবস্থা লাভ করা যায়। আত্মার আদি নাই বা অন্ত নাই। যতদিন পর্য্যন্ত ইহাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তন করিতে হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার আকার থাকে। আকার থাকিলে ইহা চেতনা ও বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়ে। আকারবিহীন হইলে ইহা সমস্ত কর্ম্ম ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। আত্মা অস্পৃষ্ট এবং অস্তিত্ব-গুণসম্পন্ন। ইহা সকল বিষয় জানে, সকল বস্তু দেখিতে পায়, সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে, কষ্টকে ভয় করে, মিত্রবৎ অথবা শত্রুবৎ কার্য্য করে এবং তাহাদের ফল ভোগ করে। যাহার চেতনা আছে তাহাই আত্মা। দেহের সংযোগে আত্মা সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রন করে। জীবহত্যা, চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যাকথন, ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগ এবং মদ্যপান এইগুলি বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাহারা এইগুলি বর্জ্জন করিতে পারে না তাহারা নরকগামী হয়।

প্রত্যেক ভিক্ষুরই আপনাকে সংযত করা উচিত। যাহা পাপ-পূর্ণ, অনিষ্টকর এবং সারহীন, তাহা বলা উচিত নয়। উপযুক্ত সময়ে তাহাকে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। স্বেচ্ছায় দেয় ভিক্ষাদ্রব্য সে গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শৈত্য, উত্তাপ, নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন, স্ত্রীলোক, ধূলি, অজ্ঞতা প্রভৃতি জয় করিতে হইবে। প্রলোভন, গর্ব্ব, কপটতা ও লোভ বর্জ্জন করিতে হইবে। যে সকল ভিক্ষু অথবা গৃহস্থ তপস্যা ও আত্ম-সংযম আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করে। যাহারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। যাহার সম্যক্ বিশ্বাস আছে, সে-ই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। এই সংসারের প্রতি যাহাদের আসক্তি আছে তাহারাই কষ্টের ভাগী হয়। প্রত্যেক ভিক্ষুর সমস্ত বন্ধন ও ঘৃণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্য্যে পাপ করা উচিত নয়। যে নিজের জীবনকে গ্রাহ্য করে না, শঠতা বর্জ্জন করে, তপস্যা আচরণ করে এবং দুষ্ট নরনারীর সংসর্গ ত্যাগ করে, সে-ই প্রকৃত ভিক্ষু। গৃহস্থের নিকট হইতে সে শয্যা, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে না। যেখানে নারীদের সমাগম হয়, সেই স্থানে সে নিদ্রা যাইতে অথবা বিশ্রাম লইতে পারিবে না। তাহাকে স্থিরচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, পরিতৃপ্ত, সংযত ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে হইবে। জন্মই দুঃখ; জরাও দুঃখ; ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখময়। সংসার দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ভিক্ষুকে সকল জীবের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং সত্য

কথা বলিতে হইবে। তাহাকে চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে; মানসিক ও দৈহিক তপস্যা করিতে হইবে। যাহার জীবন ও চরিত্র পবিত্র, যে আত্ম-সংযম আচরণ করে, যে পাপ পথ হইতে দূরে থাকে এবং যে কর্ম্মের ধ্বংস সাধন করে, সে-ই মুক্তিলাভের যোগ্য।

ধ্যান বলিতে কষ্টকর ও পাপপূর্ণ বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরতি বুঝায়। প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পবিত্র ধ্যান করা উচিত। পাপ তিন প্রকারে সংঘটিত হয়—স্বকর্ম্মের দ্বারা, সন্নিয়োগের দ্বারা এবং সমর্থনের দ্বারা। অন্তরের পবিত্রতার দ্বারা মানব নির্ব্বাণ লাভ করে। পাপকর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি। শঠতা-পূর্ণ কার্য্য করিলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নয়। যে শীতল জল পান করে না এবং কোন গৃহস্থের পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করে না, সে সম্যক্ চরিত্র লাভ করে। যাহারা নীচ বিলাস-বস্তুর মোহে পড়ে না তাহারা ধ্যান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুর গল্প বলা উচিত নয়। তাহাকে সমস্ত আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। ধার্ম্মিকেরা ইন্দ্রিয়সুখকে ব্যাধি বলিয়া মনে করে। নির্ব্বাণ শান্তির মধ্যেই নিহিত।

নির্দ্দয় পাপীরা কুকর্ম্ম করিয়া ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। দুষ্ট লোকেরা আত্ম-সুখের জন্য প্রাণীহত্যা করে। শঠেরা বিলাস-ভোগের জন্য শঠতা অবলম্বন করে। পাপ কর্ম্ম করিলে

পরিণামে দুঃখভোগ করিতে হয়। পাপীরা ইন্দ্রিয়জনিত কর্ম্ম করিয়া পাপকার্য্য করে। ধার্ম্মিকেরা মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ধার্ম্মিক লোকের অল্প খাদ্য খাওয়া উচিত, অল্প জলপান করা উচিত এবং অল্প কথা বলা উচিত। স্থিরচিত্ত, উদাসীন ও নির্লোভ হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। যে কঠোর তপস্যা করে, তাহার মন হইতে ক্রোধ ও গর্ব্ব দূরীভূত হয়। জ্ঞানী-লোকের সর্ব্ববিষয়ে স্বার্থত্যাগ করা উচিত। প্রত্যেক ভিক্ষুর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে জানা উচিত। জ্ঞানীলোকেরা প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আচারাঙ্গসূত্র হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানীলোকেরা স্বয়ং পাপকার্য্য করা উচিত নয় অথবা অপরকে পাপকার্য্য করিতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাকে সম্যক্‌ ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি অনাসক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহাকে ক্রোধ, দর্প, শঠতা, লোভ, প্রেম, ঘৃণা, প্রলোভন, জন্ম, মৃত্যু, নরক, পশুত্ব এবং কষ্ট পরিহার করিতে হইবে।

ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণীর অবিশুদ্ধ ও অগ্রহণীয় ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কোন উৎসবে তাহার যোগদান করা উচিত নয়। কোন উচ্চ স্থানে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে বস্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ তাহা পরিধান করা উচিত নয়। যে বস্ত্র উপযুক্ত এবং স্থায়ী তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। যে পাত্র কোন গৃহস্থের দ্বারা ক্রীত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা উচিত নয়। মূল্যবান পাত্রও গ্রহণ করা উচিত

নয়। কোন ইক্ষুক্ষেত্রে অথবা রশুনক্ষেত্রে যাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে। যেখানে অনেক প্রলোভন আছে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। সকল বিষয়েই কর্ম্ম নিহিত আছে। আত্মা যখন তপস্যা ও সুকৃতির দ্বারা অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করে, তখন ইহা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। কর্ম্ম আত্মার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

মহাবীরের মতে জন্ম কিছুই নয়; জাতিভেদ কিছুই নয়; কর্ম্মই সব। কর্ম্মের ধ্বংসের উপর ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি নির্ভর করে।

মানসিক স্থিরতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক। পূর্ণানন্দ, সত্যবাদিতা, সাধুতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সন্তোষ, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা— এই কয়েকটী বিষয়ের উপর আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মানসিক পবিত্রতা এই চারি প্রকারে লাভ করা যায়—(১) ভালবাসা, (২) আর্ত্তদের প্রতি ভালবাসা, (৩) সুখীদের প্রতি ভালবাসা এবং (৪) অপরাধী অথবা নির্দ্দয়ের প্রতি ভালবাসা।

দুঃখ, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু-পূর্ণ এই জগতে ধর্ম্মাচরণই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। সম্যক্ জ্ঞান, বিশ্বাসও চরিত্র সুখের মূল। ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই একুশটী সদ্‌গুণের মধ্যে কতকগুলি গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক:—(১) তাহাকে উৎসাহী হইতে হইবে, (২) সুস্থচিত্ত হইতে হইবে,

(৩) স্বভাবতঃ মধুরভাষী হইতে হইবে, (৪) জনপ্রিয়, দানশীল, সুমার্জ্জিত এবং চরিত্রবান্ হইতে হইবে, (৫) দয়ালু হইতে হইবে, (৬) সতর্ক ও সাধু হইতে হইবে, (৭) কতকগুলি নিয়মানুসারে বাস করিতে হইবে, (৮) পরদুঃখকাতর ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে, (৯) ন্যায়পরায়ণ ও অপক্ষপাতী হইতে হইবে, (১০) কৃতজ্ঞ, নম্র, বুদ্ধিমান্ ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইতে হইবে এবং (১১) আত্ম-সংযমী হইতে হইবে।

জ্ঞান পাঁচ প্রকার ঃ—(১) মতিজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা লব্ধ হয়, (২) শ্রুত জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান শাস্ত্র পাঠদ্বারা লব্ধ হয়, (৩) অবধি জ্ঞান, (৪) মনঃপর্য্যায় জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা অপরের চিন্তা ও ভাবধারা জানা যায় এবং (৫) কেবল জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান।

লেশ্যা

যাহার দ্বারা আত্মা পাপপুণ্য অর্জ্জন করে তাহাকে লেশ্যা বলে। যোগ অথবা কশায় অর্থাৎ দেহ, মন, বাক্য অথবা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াজনিত স্পন্দন হইতে লেশ্যার উৎপত্তি হয়।

কর্ম্ম

কর্ম্ম বলিতে আত্মার ক্রিয়া বুঝায়। চারিটী বাধাজনক কর্ম্ম আছে ঃ—(১) যে কর্ম্ম জ্ঞানকে বাধা দেয়, (২) যে কর্ম্ম বিশ্বাস অথবা অনুভূতিকে বাধা দেয়, (৩) যে কর্ম্ম আত্মার অগ্রগতি অথবা কৃতকার্য্যতাকে বাধা দেয়, এবং (৪) যে কর্ম্ম আত্মাকে

বিমূঢ় অথবা বিভ্রান্ত করে, এই সকল পরিপন্থী কর্ম্ম আত্মাকে এই জগতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

মহাবীরের মতে এই জগৎ অবিনশ্বর। যে সকল পদার্থ অনন্তকাল ধরিয়া বিদ্যমান আছে ও থাকিবে, ইহা তাহাদেরই সমষ্টি। এই জগতে কোন নূতন বস্তু সৃষ্ট হয় না অথবা কোন বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। এই অবিনশ্বর জগতের পদার্থগুলি জীব অথবা অজীব, আত্মা অথবা অনাত্মা রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রাণবন্ত পদার্থের প্রধান গুণ, দৃষ্টি, চেতনা ও একাগ্রতা।

মোক্ষ

মহাবীরের ধর্ম্মবাণীর সারাংশ মোক্ষ অথবা মুক্তিলাভ। ইহ-জগতের দুঃখ কষ্ট বর্জ্জন করিয়া পবিত্রতার শ্রেষ্ঠতম অবস্থা লাভ করাই মোক্ষ। এতাদৃশ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মোক্ষ বলিতে পূর্ণানন্দলাভ অথবা ইহ-জীবনের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি অথবা পার্থিব কামনার সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝায়।

মহাবীর আত্মা ও পুদ্‌গল (ব্যক্তি), এই দুইটি বিষয়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জৈন দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিলে কর্ম্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। জৈন নীতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, মোক্ষই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ত্রিরত্ন বলিতে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ বিশ্বাস ও সম্যক্

চরিত্র বুঝায়। তপস্যা দুই প্রকার, আন্তরিক ও বাহ্যিক। আন্তরিক তপস্যার দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ হয়। তপস্যার মধ্যে উপবাসই বিশেষ প্রত্যক্ষ।

জৈনধর্ম্মের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে:— মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য, ধর্ম্মের বাঞ্ছিত বস্তু, একধর্ম্মাবলম্বী ও গুরুর আদেশ পালন, গুরুর নিকট পাপ স্বীকার, আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ, আত্মার নৈতিক ও জ্ঞানবিষয়ক পবিত্রতা, ২৪ জন জিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, গুরুর প্রতি ভক্তি, আত্মত্যাগ, স্তুতি ও স্তোত্র, নিয়মানুবর্ত্তিতা, তপশ্চর্য্যা, ক্ষমা, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি, চিন্তার একাগ্রতা, আত্ম-সংযম, আত্মবিশুদ্ধি, মানসিক স্বাধীনতা, মনুষ্য-সমাগমশূন্য স্থানে বিচরণ, সংসার হইতে দূরে অবস্থান, আমোদ-প্রমোদ, খাদ্য, কাম, সংসর্গ প্রভৃতি বর্জ্জন, হিতজনক কার্য্য করা, সমস্ত সদ্‌গুণ পালন, কাম ও লোভ হইতে মুক্তি, সরলতা, বিনয়, অন্তরের অকপটতা, দেহ, মন ও বাক্যের সতর্কতা, দেহ, মন ও বাক্যের নিয়মনিষ্ঠা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও পুণ্য লাভ, ইন্দ্রিয়-দমন, ক্রোধ, গর্ব্ব, শঠতা, লোভ, প্রেম, ঘৃণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস জয়, দৃঢ়-চিত্ততা এবং কর্ম্ম হইতে মুক্তি।

পরিশিষ্ট

জৈন ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়

কতকগুলি খ্যাতনামা জৈন তীর্থঙ্কর ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

পার্শ্বনাথ

অশ্বসেন নামে বারাণসীর একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল বামাদেবী। এক গভীর রজনীতে বামাদেবী যখন তাঁহার শয্যায় শুইয়াছিলেন তখন তিনি একটী কৃষ্ণবর্ণের সর্পকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। অন্ধকারে সর্পটীকে ভালরূপ দেখিতে না পাওয়ায় বামাদেবী ভীত হন নাই। তাহার পরদিন রাজা এই ঘটনাটি জানিতে পারিয়া একটী ভবিষ্যৎবাণী করেন যে তিনি একটী বীর পুত্র প্রসব করিবেন। বামাদেবী শীঘ্রই বহুগুণসমন্বিত এবং সুশ্রী পুত্র লাভ করেন এবং সে পার্শ্বকুমার নামে পরিচিত হইয়াছিল। বাল্যে বিলাসিতায় লালিত-পালিত হইয়া পরে সে তাহার বীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ কুশস্থল নামে একটী সুবিশাল নগরের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁহার কন্যা প্রভাবতীকে সুশিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরে তাহার একটী যোগ্য স্বামীর অন্বেষণ

করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কন্যার জন্য উপযুক্ত স্বামী পান নাই। এক দিবস যখন প্রভাবতী তাহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল সে পার্শ্বকুমারের যশোগান শ্রবণ করে এবং পার্শ্ব-কুমারকে বিবাহ করিতে মনস্থ করে। পরে সে তাহার পিতা-মাতাকে মনোভাব জানায়। প্রসেনজিৎ প্রভাবতীকে পার্শ্ব-কুমারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন। অনেকগুলি রাজা তাহাকে বিবাহ করিতে চান। কলিঙ্গ দেশের প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা যবন তাহাকে বিবাহ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। প্রভাবতী পার্শ্বকুমারকে বিবাহ করিতে যাইবেন এই সংবাদটী যবন পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবদ্দশায় প্রভাবতী পার্শ্বকুমারকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। যবন বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহার পিতার রাজধানী কুশস্থল আক্রমণ করিলেন। প্রসেনজিৎ রাজা অশ্বসেনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পার্শ্বকুমার কুশস্থল নগরে গমন করিয়া রাজা যবনের নিকট দূত প্রেরণ করেন। রাজা যবন-দূতকে বলেন যে পার্শ্বকুমার যদি জীবনের আশা রাখেন তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত। যবনের মন্ত্রী তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে পার্শ্বকুমারের সহিত সে যুদ্ধে পরাজিত হইবে। পরে রাজা যবন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া পার্শ্বকুমারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া-

ছিলেন ; অশ্বসেন প্রভাবতীকে লইয়া পার্শ্বকুমারের শিবিরে যান এবং বলেন "তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিবে যদি তুমি আমার কন্যা প্রভাবতীর পাণিগ্রহণ কর।" পার্শ্বকুমার উত্তরে বলেন, "আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিতে নয়। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং আমি আমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" প্রভাবতীর পিতা রাজা প্রসেনজিৎ এবং রাজা অশ্বসেন প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে পার্শ্বকুমারকে বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। পার্শ্বকুমার বলেন, "বিবাহ-জীবন আমি পছন্দ করি না।" কিন্তু তাঁহার পিতার আদেশে তিনি প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। এই বিবাহে প্রভাবতী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কমঠ নামে এবজন ভিক্ষু প্রখর রৌদ্রের তাপে পঞ্চাগ্নি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁহার আসনের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। মেধাবী পার্শ্বকুমার ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠের মধ্যে একটী সর্পকে পুড়িতে দেখিয়া বলিলেন, "মনুষ্য দেহকে কষ্ট দিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া মূর্খের কর্ম্ম। ধ্যান ধর্ম্মের একটী অংশ বিশেষ। অহিংসা সর্ব্বগুণের শ্রেষ্ঠ গুণ।" কমঠ উত্তরে বলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি কি জান? তুমি অশ্ব এবং হাতী চড়িতে জান। আমার মত ভিক্ষুই ধর্ম্মকে জানে।" ইহা শুনিয়া পার্শ্বকুমার ঐ কাষ্ঠ খণ্ডকে সোজা করিয়া কাটিতে অনুরোধ করেন এবং যখন কাষ্ঠখণ্ড এইভাবে কাটা হইতেছিল তখন একটী অগ্নিদগ্ধ সর্পকে বহির্গত হইতে দেখা গেল। ঐ সর্প

নবকার মন্ত্র শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করে। ইহা দেখিয়া কমঠ লজ্জিত ও রাগান্বিত হন কিন্তু তিনি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করেন নাই। ঐ ভিক্ষুটী শীঘ্রই মারা যান। বসন্তকালে একদিন পার্শ্বকুমার ও প্রভাবতী বনে বিচরণ করিয়া একটী প্রাসাদে আসিয়া বিশ্রামের জন্য বসিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা নেমি-নাথের বিবাহের ছবি দেখেন, এবং আরও দেখেন যে নেমিনাথ প্রাণীদিগের চীৎকার শ্রবণ করিয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহার রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই সকল ছবি দেখিয়া পার্শ্বকুমার ভাবিতে লাগিলেন যে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করা, বিলাসে দিন যাপন করা নহে। তাহার পর তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। দরিদ্রদিগকে তিনি আশ্রয় দিতেন, পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা ছিলেন এবং কাহাকেও কষ্ট দিতেন না। পার্থিব সুখে তাঁহার ঘৃণা জন্মিল এবং পরে তিনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। পার্শ্বকুমার রাত্রে একটী পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষের পাদমূলে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। মেঘমালী পার্শ্বকুমারকে শত্রু বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার মনে ভীতি উৎপাদনের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে পার্শ্বকুমার মুক্তিজ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার উপদেশে বহু নরনারী পবিত্র জীবন যাপন করেন। পার্শ্বকুমার তীর্থস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তীর্থঙ্কর বলা হইত। তাঁহার

পিতা মাতা ও প্রভাবতী সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন। একশত বৎসর বয়সে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নেমিনাথ

যমুনাতীরস্থিত সৌরীপুর নামে একটী বৃহৎ নগরে সমুদ্রবিজয় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মহিষী শিবাদেবীর গর্ভে অরিষ্টনেমির জন্ম হয়। অরিষ্টনেমির আর একটী নাম ছিল নেমিনাথ। সমুদ্র-বিজয়ের নয়টী ভ্রাতা ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম ছিল বসুদেব। বসুদেবের অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার রোহিণী ও দেবকী নামে দুইটী স্ত্রীর গর্ভে বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। সৌরীপুরের নিকট মথুরা নামে একটী বৃহৎ নগর ছিল এবং ইহার অত্যাচারী রাজার নাম ছিল কংস। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব কংসর জীবন নাশ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করেন। জরাসন্ধ তাঁহার জামাতা কংসের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন। উগ্রসেন মথুরা ত্যাগ করিয়া কাথিয়ার গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে সমুদ্রতটে দ্বারকা নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইয়াছিলেন। এক দিবস নেমিনাথ শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রশালায় উপস্থিত হইয়া একটী সুন্দর শঙ্খ দেখেন। যখন নেমিনাথ শঙ্খটী তুলিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি শুনিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ইহা অন্য কেহ তুলিতে অসমর্থ। নেমিনাথ সহজে ইহাকে তুলিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নেমিনাথের বল পরীক্ষা করেন এবং

পরীক্ষার ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে নেমিনাথের বল তাঁহার বল অপেক্ষা অধিকতর। নেমিনাথকে বিবাহ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং পরে নেমিনাথ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করেন। রাজা উগ্রসেনের কন্যা রাজমতীর সহিত নেমিনাথের বিবাহ স্থির হয়। নেমিনাথ উগ্রসেনের প্রাসাদে উপস্থিত হইবামাত্র জীবের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি রথচালককে এই ক্রন্দন-ধ্বনির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। রথচালক বলে যে সকল জীব এই বিবাহ দিনে তাহাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছে, তাহারাই ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। জীবগুলিকে মুক্ত করিতে তিনি রথচালককে আদেশ দিলেন এবং রথচালকও তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি রথ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যখন রাজকন্যা শুনিলেন যে নেমিনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি নেমিনাথের জন্য চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন যে নেমিনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না। নেমিনাথ সাধুর জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি সামান্য খাদ্য খাইতেন, ভূমিতে শয়ন করিতেন, একটীমাত্র পরিধেয় পরিধান করিতেন। তিনি সকল লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শীঘ্রই নেমিনাথ মুক্তি-জ্ঞান লাভ করেন। মুক্তি-জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি লোকগুলিকে সদা সত্য কথা বলিতে, সকল লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে, প্রভুর বিনা

অনুমতিতে কোন বস্তু না লইতে ও শীল পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অনেক লোক তাঁহার পরামর্শানুযায়ী ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাজমতী নেমিনাথকে অনুসরণ করিয়া পরে মুক্তিলাভ করেন।

নেমিনাথ দীর্ঘকাল পরে গির্ণার্ পর্ব্বতের চূড়ায় নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই গির্ণার্ পর্ব্বত জৈনদিগের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিচিত।

কুমারপাল

সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নামে গুজরাটে একজন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদের নিকট হইতে যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে কুমারপাল তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, তখন তিনি কুমারপালকে বধ করিবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দেথলীর নৃপতি ত্রিভুনপালের পুত্রের নাম কুমারপাল। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল ভোপালদে। মহীপাল এবং কীর্তিপাল নামে তাঁহার দুইটী ভ্রাতা ছিল। প্রেমলদেবী এবং দেবলদেবী নামে তাঁহার দুইটী ভগ্নী ছিল। যখন কুমারপাল জানিতে পারিলেন যে সিদ্ধরাজ তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছেন, রাত্রিকালে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুবেশে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি পাঠন দেশে একটী দেবালয়ের পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইলেন। সিদ্ধরাজ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদনের জন্য সকল পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ

করিয়াছিলেন। কুমারপাল এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটী বনে আশ্রয় লইলেন। রাজা সিদ্ধরাজের সৈন্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। অতি প্রত্যুষে কুমারপাল তাঁহার ক্ষতদেহ লইয়া একটি বৃক্ষতলে আরাম করিতে করিতে দেখিলেন যে একটি মূষিক ২১টী মুদ্রা একটীর পর একটী গহ্বর হইতে বাহির করিতেছে। মুষিককে একটী মুদ্রা রাখিবার নিমিত্ত গহ্বরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কুমারপাল অবশিষ্ট ২০টী মুদ্রা নিজে লইলেন। মূষিক অবশিষ্ট মুদ্রা দেখিতে না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দেখিয়া কুমারপাল অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে একটী মূষিকেরও মুদ্রার প্রতি মায়া আছে। সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কুমারপাল তিন দিবস ধরিয়া কোন আহারাদি না পাইয়া মৃতব্যক্তির ন্যায় পথে শুইয়াছিলেন। শ্রীদেবী শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কুমারপালকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দয়া করিয়া কিছু খাদ্য দিয়াছিলেন। কুমারপাল এই সামান্য খাদ্য পাইয়া বহু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পরে তাঁহার জন্মভূমি দেথলীতে যান। সিদ্ধরাজ যখন শুনিলেন যে কুমারপাল স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। সজ্জন নামে একজন কুম্ভকার কুমারপালকে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কুমারপাল আপন পরিবারবর্গকে মালব দেশে পাঠাইয়া দিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন; বোসিরী নামে একজন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং

বোসিরী তাঁহাকে খাদ্য দিয়া সাহায্য করিত। খুব শীঘ্রই কুমারপাল বোসিরীর স্থান ত্যাগ করিয়া খংভাত দেশে গমন করেন। সেই স্থানে হেমচন্দ্র নামে একজন জৈন শিক্ষকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই শিক্ষক ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে তিনি গুজরাটের নরপতি হইবেন। উদায়ন নামে একজন মন্ত্রী তাঁহাকে আশ্রয় দেন। সিদ্ধরাজ এই সংবাদ পাইয়া কুমারপালকে ধরিয়া লইয়া আসিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু সৈন্যগণ কুমারপালকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হেমচন্দ্র কুমারপালকে বলিলেন, "তোমাকে আর বহুদিন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। তুমি শীঘ্রই গুজ-রাটের রাজা হইবে।" কুমারপাল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি জৈনধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক হইবেন। মালবদেশে আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কুমারপাল আরও অনেক দেশ দেখিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ মরণাপন্ন জানিয়া তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া গুজরাটে আসিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ তাঁহার মন্ত্রীপুত্রকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কুমারপাল পাঠনদেশে আসিয়া তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কুমারপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের ঋণ ভুলিয়া যান নাই। ভোপালদেকে তিনি প্রধানা মহিষী করেন এবং ভীমসিংহকে দেহরক্ষক পদে

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সজ্জন শত শত গ্রামের উপরাজা হন। লাটদেশের বিচারাধিপতি হইয়াছিল বোসিরী এবং উদায়ন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিল। জৈন-শিক্ষক হেমচন্দ্রকে তাঁহার গুরুপদে বরণ করেন। কুমারপালের অধিনস্থ রাজারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। আজমীরের রাজা কুমার-পালের বশ্যতা স্বীকার করে। কোঙ্কনদেশের রাজা মল্লিকার্জ্জুনকে তিনি পরাস্ত করেন। সুরাটের সমরসিংহ এবং আরও অনেক ছোট ছোট রাজাকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। কুমারপাল অষ্টাদশ দেশের নৃপতি ছিলেন। উত্তরে তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল পাঞ্জাব পর্য্যন্ত, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে ইন্দাস নদী পর্য্যন্ত। হেমচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার রাজ্যে জীবননাশ বন্ধ করিয়া দেন। সোমনাথের জৈনমন্দির এবং আরও বহুসংখ্যক জৈন-মন্দির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে লোকেরা সুখশান্তিতে বাস করিত। অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তিনি চৌদ্দহাজার দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু দেশহিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাজত্ব করেন এবং জৈনগুরুর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। একাশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বস্তুপাল ও তেজপাল

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোলাংকীর রাজগণের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বীরধবল নামে একজন রাজা খুব বলশালী হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন। বীরধবলের আশ্রজ নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। আশ্রজ বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া সুংহালক নামে একটী গ্রামে বাস করিতেন। আশ্রজের তিনটী পুত্র এবং সাতটী কন্যা ছিল। পুত্রদিগের মধ্যে বস্তুপাল এবং তেজপাল সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। বস্তুপাল এবং তেজপালের বিদ্যা-শিক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ললিতা এবং অনুপমা নাম্নী দুইটী বালিকার ইঁহারা পাণিগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা মাণ্ডব-দেশে বাস করিতেন। ইঁহাদের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। মাতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পুণ্যতীর্থ শত্রুঞ্জয়ে যান। ঢোলকাগ্রামে সোমেশ্বরের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব হয়। গুজরাটে বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা বীরধবল একজন যোদ্ধার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। সোমেশ্বর রাজার নিকট ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় করিয়া দিয়া বলেন যে ইহাঁরা জৈনধর্ম্মের একনিষ্ঠ সাধক এবং রাজকার্য্য পরিচালনে দক্ষ। রাজা তাঁহার রাজ্য পরিচালনের জন্য ইঁহাদের অনুরোধ করেন। বস্তুপাল বলেন, "আমি দেবতার আরাধনা শেষ করিয়া রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।" তিনি আরও বলেন, "যদি আমাদের এই কার্য্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের নিকটে যে তিনলক্ষ মুদ্রা থাকিবে তাহা আমরা লইয়া যাইব।" রাজা ইহাতে সম্মত হন এবং বস্তুপালকে প্রধান মন্ত্রীপদ দেন ও তেজপালকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া দেন। বস্তুপাল রাজ্যের অনেক মন্দ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত ভার তেজপালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া এবং তাঁহার বলশালী

সৈন্য লইয়া রাজার সহিত বহির্গত হন। যে সমস্ত জমিদার কর দেন নাই, সেই সমস্ত কর তিনি আদায় করেন এবং সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। বস্তুপাল নিকটস্থ দেশগুলি জয় করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সংগান্ এবং চামণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করেন। বস্তুপাল সমগ্র কাথিয়াওয়ার দেশ জয় করেন। তাহার পর রাজার সহিত গির্ণারে গমন করেন এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বহু ধর্ম্মাচরণ করেন। ভদ্রেশ্বরের রাজা ভীমসিংহকে নিজের বশে আনেন। খংভাতের সিদ্দিক নামে একজন ধনী বণিক আর একজন বণিকের ধন লুণ্ঠন করে এবং তাহাকে হত্যা করে। বস্তুপাল ইহা শুনিয়া সিদ্দিকের উপর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। তাহার পর তিনি খংভাত দেশে প্রবেশ করিয়া বহু মহামূল্য অলঙ্কার লাভ করেন। দিল্লীর সম্রাট মৌজদীনের গুজরাটদেশ আক্রমণের ফলে বস্তুপাল ও তেজপালের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হয় এবং সম্রাট পরাস্ত হন। এই ভ্রাতাদ্বয় মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। স্বধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাৎসরিক বহু অর্থ ইহাঁরা ব্যয় করিতেন। শত্রুঞ্জয়, গির্ণার্ এবং আবুপর্ব্বতে তাঁহারা জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং শত্রুঞ্জয় এবং গির্ণার্ পর্ব্বতে সংঘ স্থাপন করন। কেদারনাথ হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত এমন কোন জৈনতীর্থ ছিল না, যাহা তাঁহাদের সাহায্য পায় নাই। কাশী, দ্বারকা, সোমনাথ এবং পাঠনদেশে প্রত্যেক বৎসরে তাঁহারা

বহু অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। অনেক শিবমন্দির এবং মুসলমানদিগের মস্‌জিদ তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা বীরধবলের মৃত্যুর পর যুবরাজ বিশলদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বস্তুপাল শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়।

ক্ষেমা

ক্ষেমা দেদ্রাণীর পুত্র। ক্ষেমা তাঁহার জীবনের বহুদিন ধরিয়া দেশে দেশে ব্যবসা করিতেন। তিনশত ষাট দিন ধরিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে তিনি অন্ন দিয়াছিলেন। একটি গহ্বরের মধ্যে ক্ষেমার বহু সংখ্যক ধন নিহিত ছিল। বাদশাহ যখন ক্ষেমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহার কয়টি গ্রাম আছে, উত্তরে ক্ষেমা বলেন যে দুইটি, একটী তুলাদণ্ড ও অপরটী পাত্র। এই তুলাদণ্ড লইয়া তিনি শাকশব্জী ক্রয় করেন এবং পাত্রের দ্বারা ঘৃত এবং তৈল বিক্রয় করেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ক্ষেমা এক বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক লোককে দান করিয়াছিলেন। তিনি সঞ্জয় পুণ্যতীর্থে বহুদিন জীবন যাপন করিয়া তথায় মারা যান।

পেথড়কুমার

পিতার মৃত্যুর পর পেথড়কুমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে সমস্ত হারাইয়া এতদূর দীন হইয়া পড়িল যে তাহার পক্ষে তাহার স্ত্রী পদ্মিনী ও তাহার একটিমাত্র পুত্র ঝাঝনের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। নিমার দেশের

মধ্যস্থিত নামত্বরী গ্রামে একটী বিহারে সে যখন কালাতিপাত করিতেছিল, সেই সময় একটী সুশিক্ষিত জৈনমুনি দরিদ্র পেথড়কুমারকে দেখিতে পাইয়া অর্থোপার্জ্জনের ব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। পেথড়কুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে যদি পুনর্ব্বার অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, সেই অর্থের কিয়দংশ সৎকার্য্যের জন্য ব্যয় করিবে ; দিন দিন সে এত গরীব হইয়া পড়িল যে স্ত্রীপুত্র লইয়া সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে মালবদেশে মাণ্ডবগড় নামে একটি সুন্দর নগর ছিল। এখানে বহু বণিকের বাস ছিল। পেথড়কুমার এই নগরে আসিয়া একটী দোকান খোলে। নিকটস্থ গ্রামের স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সে বিশুদ্ধ ঘৃত কিনিত এবং নির্দ্ধারিত দরে তাহা বিক্রয় করিত। তাহার সত্যবাদিতার জন্য ব্যবসায়ে সে উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং খুব অল্প সময় মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। ঐ দেশের রাজা জয়সিংহ তাহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং তাহার পুত্রকে সত্যবাদিতার জন্য খুব স্নেহ করিতেন। রাজা পেথড়কুমারকে তাহার প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পুত্র ঝাঝনকে পুলিশের নেতা করেন। পেথড়কুমারের নিকট একটী চিত্রাবলি ছিল যাহার বলে ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইত না। পেথড়কুমার রাজার করের হার কম করিয়া দিয়াছিল এবং দেশবাসীর উন্নতির দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। পেথড়কুমার আবু পর্ব্বতে আসিয়া একটী জৈন-

মন্দির দেখিয়াছিল। মাণ্ডবগড় এবং দেবগিরিতে সুন্দর জৈন-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। রাজা জয়সিংহের মহিষী লীলাবতী এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার দাসী পেথড়কুমারের বস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরীর আবৃত করে এবং ইহার ফলে রাজমহিষী সুস্থ হইয়া নিদ্রা .যান। কোন একজন দুষ্ট লোক রাজাকে সংবাদ দেয় যে লীলাবতী প্রধান মন্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বস্ত্র শরীরে আবৃত করিয়া শয়ন করিতেছেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং প্রধান মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাণীকে হত্যা করিবার জন্য অরণ্যে পাঠাইয়া দেন। ঘাতকেরা রাণীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। ঝাঝনকুমার রাজমহিষীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যায়। এই সময়ে রাজার একটী প্রিয় হস্তী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর একটী দাসী পেথড়কুমারের বস্ত্র লইয়া আসিয়া হস্তীর শরীরটীকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার ফলে জন্তুটী তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পায়। তখন ঐ দাসীটী রাজাকে বলে যে পেথড়কুমারের বস্ত্রদ্বারা রাজমহিষীর শরীর আবৃত করিবার ফলে তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হন। পেথড়কুমারকে কারামুক্ত করেন এবং তাঁহার দোষ তিনি স্বীকার করেন। যখন রাজা শুনিলেন যে রাণী জীবিতা, তিনি রাণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং রাণীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা দুইজনে সুখে রাজত্ব করিতে

লাগিলেন। পেথড়কুমার বৃদ্ধ বয়সে বহুলোক লইয়া শত্রুঞ্জয় তীর্থে আসিয়াছিল। এই তীর্থে সে আদিনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও গির্ণার দর্শন করিয়া সে মাণ্ডবে ফিরিয়া যায়। তাহার চেষ্টায় অনেকগুলি ভাল জৈন পুস্তক লেখা হইয়াছিল। গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সে তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল।

বিমলশাহ

লাহির নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুক বনরাজ নামে গুজরাটের প্রধান নৃপতির সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তিনি একজন ক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নাম ছিল বীর। বীরের পত্নী বীরমতীর গর্ভে বিমলশাহের জন্ম হয়। তাহার অঙ্গে ৩২টী চিহ্ন ছিল। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া যখন বিমলশাহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন বীরমতী তাহাকে মহাবীরের উপদেশগুলি পালন করিতে বলেন। বীরমতী যখন জানিতে পারিলেন যে বিমলশাহকে লইয়া সেখানে বাস করা নিরাপদ নহে, তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া পিতৃগৃহে বাস করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। বিমলশাহ তাহার মাতুলকে কৃষিকার্য্যে ও পশুপালনকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। সে অশ্বারোহণে এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। শ্রীদত্ত নামে পাটনের একজন বণিক শ্রী নাম্নী তাঁহার কন্যাকে বিমলশাহের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। যখন বিমলশাহ শুনিল যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই বিবাহ

সম্পন্ন হইবে না, সে অর্থোপার্জ্জনের জন্য একটী অরণ্যে গমন করে। অরণ্য মধ্যে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া এই বিষয় চিন্তাকালে হঠাৎ সে তাহার যষ্টিটী একটী গর্ত্তে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখিল যে একটী পাত্র বহু মুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ঐ পাত্রটী সে গৃহে আনিল এবং মাতার সম্মুখে রাখিয়া দিল। খুব শীঘ্রই শ্রীদেবীর সহিত বিমলশাহের বিবাহ হইল। মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া মাতা এবং স্ত্রীর সমভিব্যাহারে পাটনে উপস্থিত হইল। তথায় সে একদিন দেখিল যে রাজসৈন্যের মধ্যে কেহই চিহ্নিত বস্তুকে ছেদ করিতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়া সে বলিল যে মহারাজ ভীমদেবের লুপ্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব। সেই সময় মহারাজ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনিও সেই চিহ্নিত বস্তুকে ছেদ করিতে পারিলেন না। বিমলশাহ হাস্যবদনে বলিল যে আপনারা সকলেই রাজ্যশাসনে অসমর্থ। ইহা শুনিয়া মহারাজ তাহাকে তাহার ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিমলশাহ বলিল একটী বালককে ১০৮টী পান পাতা লইয়া ভূমিতে শয়ন করাইয়া দিন এবং ঐ চিহ্নিত পাতা-গুলি আমি ছেদ করিব এবং বালকটী কোনরূপে আঘাত পাইবে না। ইহাতে যদি আমি অসমর্থ হই আপনি আমাকে হত্যা করিবেন। রাজা বিমলশাহের ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্য বিমলশাহের অধীনে রাখিয়া দিলেন। খুব শীঘ্রই বিমলশাহ মন্ত্রীপদ পাইল।

জিনেশ্বরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সে সৈন্যদলের ক্ষমতা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার ভোগের জন্য একটী সুবৃহৎ এবং সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রাজা এই সকল সংবাদ পাইয়া বিমলশাহের গৃহে গমন করিয়া সংবাদ সঠিক জানিয়া কিভাবে বিমলশাহকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। একজন মন্ত্রী বলিলেন যে আহারের সময় নগরে একটী ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং বিমলশাহকে ঐ ব্যাঘ্র ধরিবার আদেশ করা হউক। ব্যাঘ্রটী বিমলশাহকে বধ করিবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজা তাহাই করিলেন কিন্তু বিমলশাহ অতিরিক্ত বলের দ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরিয়া তাহার আবাসস্থানে ছাড়িয়া দিল। দেশবাসীরা ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু রাজা এবং মন্ত্রীবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বিমলশাহ রাজমল্লকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল। তাহার প্রতি রাজার আচরণের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিমলশাহ অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে তাহার পিতামহী যে কর্জ্জ লইয়াছিল সে কর্জ্জ পরিষোধ না করায় রাজা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যখন বিমলশাহ জানিতে পারিল যে তাহার বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র চলিতেছে তখন সে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং হস্তী ও রথ লইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল। সে আবু পর্ব্বতে গমন করিল। আবু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রাবতী নামে একটী নগরের রাজা যখন শুনিলেন যে বিমলশাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে

আসিতেছে, তখন তিনি তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজা ভীমদেবের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া সে অনেক দেশ জয় করিয়াছিল। সিন্ধুদেশের অত্যাচারী রাজা পণ্ডিয়াকে সে পরাস্ত করে এবং পরমারের রাজা খুণ্ডদেবকে রাজা ভীমদেবের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। তাহার পর সে চন্দ্রাবতীর সিংহাসনে অধিরোহণ করে। রাজা বিমলশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া বহু সুন্দর মন্দির এবং পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন এবং বাজার বসাইয়াছিলেন। শ্রীধর্ম্ম ঘোষ নামে কোন একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পরামর্শ দেন। বিমলশাহ আবু পর্ব্বতে আসিয়া বহু সংখ্যক শিবমন্দির দেখিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য খুব অধিক ছিল। বিমলশাহ একটী জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য সামান্য জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। আবু পর্ব্বতে এই সুন্দর জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে ভগবান ঋষভদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই মন্দির এখনও আবু পর্ব্বতে আছে।

শ্রীপাল

শ্রীপাল রাজা সিংহরথ এবং রাণী কমলপ্রভার পুত্র। তিনি অঙ্গদেশে চম্পার রাজা ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। শ্রীপালের খুল্লতাত অজিতসেন রাণী কমল-

প্রভা এবং শ্রীপালকে বধ করিবার জন্য রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। রাণী এই সংবাদ পাইয়া গভীর রাত্রে শ্রীপালকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ অরণ্য মধ্যে ৭০০ কুষ্ঠরোগীদের সহিত তিনি বাস করিতেছিলেন। অজিতসেনের সৈন্যগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে ধরিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। শ্রীপাল কুষ্ঠরোগীর নিকট হইতে খাদ্য লইয়াছিল বলিয়া সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। তাহার দেহের চর্ম্ম উম্বর বৃক্ষের ছালের মত ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল উম্বরাণা। কোন একটী লোকের নিকট কমলপ্রভা জানিয়াছিলেন যে কৌশাম্বীর একজন বৈদ্য কুষ্ঠব্যাধি সারাইতে পারে। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলেন এবং সমস্ত কুষ্ঠরোগীদিগকে উজ্জয়িনীতে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কুষ্ঠরোগীগণ তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল। এই সময়ে উজ্জয়িনীর প্রতিপাল নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সুরসুন্দরী ও ময়নাসুন্দরী নামে দুইটী শিক্ষিতা কন্যা ছিল। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য কোথায় তাহারা নির্ভর করে, নিজের অদৃষ্টের উপর—কিংবা পিতার উপর। সুরসুন্দরী উত্তর করিয়াছিল যে সে পিতার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ময়নাসুন্দরী বলিল যে সে তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কোন

একটী যুবরাজের সহিত তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দিলেন এবং দ্বিতীয়া কন্যা ময়নাসুন্দরীর বিবাহ উম্বরাণা নামে একজন কুষ্ঠরোগীর সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা ময়নাকে বলিলেন, "এখন তুমি তোমার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যে ফল পাইলে তাহা ভোগ কর"। ময়না বলিল, "যদি অদৃষ্ট আমাকে সুখ দেয় আমি নিশ্চয় পাইব।" ময়না এবং উম্বরাণা স্বামীনাথ নামে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া নয়বার অম্বিল ব্রত উদ্‌যাপন করিল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর উম্বরাণা কুষ্ঠরোগ হইতে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করিল এবং ৭০০ কুষ্ঠরোগীও এই উপায় অবলম্বনের ফলে রোগমুক্ত হইল। কমলপ্রভা কৌশাম্বীর পথে এই সংবাদ পাইয়া উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া গেলেন। ময়নার মাতুল তাহার নবনির্ম্মিত প্রাসাদে তাহাকে লইয়া আসিল। এক দিবস যখন শ্রীপাল অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামে গমন করিতেছিল তখন একজন আর একজনকে দেখাইল "ঐ রাজার জামাতা যাইতেছে।" শ্রীপাল এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'যে ব্যক্তি তাহার শ্বশুরের নামে পরিচিত হয় তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব আর কেহ নাই।' শ্রীপাল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং সে তাহার মাতা ও স্ত্রীকে বলিল যে এক বৎসর পরে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যখন সে একটী পর্ব্বতে উপস্থিত হইল তখন সে দেখিল কোন একটী লোক কোন শাস্ত্রে সুদক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ঐ লোকটী শ্রীপালকে তাহার

সহিত কিছুকাল বাস করিতে অনুরোধ করিল। শ্রীপাল অনুরোধ রক্ষা করিল। ঐ লোকটী শ্রীপালের ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দুইটী বিদ্যা শিখাইল। একটীর বলে সে জলে ডুবিবে না এবং আর একটীর বলে কোন অস্ত্র তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। তাহার পর শ্রীপাল ঐ স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া ভৃগুোচ বন্দরে উপস্থিত হইলে ধবলশেঠ নামে একজন ধনী বণিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ধবলশেঠ বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া ৫০০ জাহাজ যোগে বহুদেশে যাইতেছিলেন। শ্রীপাল তাঁহার একটী জাহাজে স্থান পাইল এবং বর্ব্বরকোট বন্দরে যখন জাহাজগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, বন্দরকর্ম্মচারীগণ তাঁহার নিকট হইতে কর চাহিল। ধবলশেঠ কর দিতে অস্বীকার করায় বন্দী হইলেন। শ্রীপাল ভাবিলেন যে ধবলশেঠের প্রাণনাশ হইবে এবং তাঁহার বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ধৃত হইবে। শ্রীপালের একটী কৌশলের সাহায্যে ধবলশেঠ মুক্ত হইয়া শ্রীপালকে বাণিজ্যদ্রব্যের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলেন। শ্রীপাল বর্ব্বরকোটের রাজার কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছিল। রত্নদ্বীপের রাজার কন্যাকে শ্রীপাল পরে বিবাহ করে। শ্রীপাল তাহার দুইটী স্ত্রী এবং ধবলশেঠকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধবলশেঠ শ্রীপালের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধবলশেঠ শ্রীপালকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীপাল 'জলতরণী' বিদ্যার প্রভাবে সন্তরণ দিয়া কঙ্কনে উপস্থিত হইল এবং তথাকার রাজকন্যার

পাণিগ্রহণ করিল। শ্রীপালকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া ধবলশেঠ শ্রীপালের দুই পত্নীর সতীত্ব নাশ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে ধবলশেঠ শ্রীপালকে কঙ্কনে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাল হীনবংশজাত ছিল ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধবলশেঠ ভাল লোক না হইলেও শ্রীপাল তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। ধবলশেঠ রাত্রিকালে শ্রীপালের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পড়িয়া গিয়া মারা যান। কোন একজন রাজকন্যা ঘোষণা করিয়াছিল—যে তাহাকে বীণাবাদ্যে পরাস্ত করিতে পারিবে সে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে। শ্রীপাল তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। শ্রীপাল বহু বিবাহ করিয়াছিল। তাহার পর আটটী স্ত্রী এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে শ্রীপাল উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হয়। কোন এক বলশালী রাজা তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে এই মনে করিয়া উজ্জয়িনীর রাজা শ্রীপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শ্রীপাল তাহার মাতা ও প্রথমা স্ত্রী ময়নাসুন্দরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল। তাহার পর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া চম্পায় উপস্থিত হয় এবং চম্পার রাজা অজিতসেনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। কিন্তু অজিতসেন তাহার অনুরোধ রক্ষা না করায় তাহার সহিত যুদ্ধ হইল, ঐ যুদ্ধে অজিতসেন পরাস্ত হন। শ্রীপাল চম্পার সিংহাসনে অধিরোহণ করিল। অজিতসেন ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে

লাগিলেন। রাজা শ্রীপাল, তাহার মহিষী ময়নাসুন্দরী এবং অপর মহিষীগণ সকলেই পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পরে মোক্ষলাভ করিয়াছিল।

রাণী চেলনা

•চেটক নামে মহাবীরের এক মাতুল বৈশালীর রাজা ছিল; তাহার সাতটী কন্যা ছিল এবং ইহাদের মধ্যে তুইটী কুমারী সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ্ ছিল—এই তুইটীর নাম সুজ্যেষ্ঠা এবং চেলনা। এই তুইটী কন্যা সুলিখিত পুস্তক পাঠে এবং ধর্ম্মালোচনায় সময় অতিবাহিত করিত। ইহারা পরমা সুন্দরী ছিল। মগধের প্রতাপান্বিত রাজা শ্রেণিক চেটককে জানাইলেন যে এই তুইটী কন্যার মধ্যে একটীকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। ইহার উত্তরে চেটক বলেন যে বংশে রাজা শ্রেণিকের জন্ম সে বংশ অপেক্ষা আমাদের বংশ উচ্চতর। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রেণিক অত্যন্ত রাগান্বিত হন। সুজ্যেষ্ঠা রাজা শ্রেণিকের চিত্র দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মনস্থ করেন। সুজ্যেষ্ঠা প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ খনন করেন। একটী নির্দ্ধারিত দিনে সুজ্যেষ্ঠা চেলনাকে সঙ্গে লইয়া সেই সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন; কিছুদূর যাইয়া তাঁহার মনে পড়িল যে অলঙ্কারের বাক্স তিনি সঙ্গে আনেন নাই। তিনি চেলনাকে রথে বসিতে ও অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে রথটী খুব দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে কেহ চেলনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই কথা

শুনিয়া রাজার সৈন্যগণ রথের পশ্চাতে ধাবিত হইল। সুজ্যেষ্ঠা ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। চেলনা রাজা শ্রেণিকের অত্যন্ত প্রিয় সম্রাজ্ঞী হইয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। চেলনা মহাবীরের একজন একনিষ্ঠ ভক্তছিলেন এবং রাজার নিকট মহাবীরের উপদেশ ব্যাখ্যা করিতেন। ফলে শ্রেণিক মহাবীরের একজন ভক্ত হইয়া উঠিলেন। যখন চেলনা গর্ভিণী হইলেন তখন তাঁহার স্বামীর হৃদয়ের মাংস খাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন—যে সন্তান আমি প্রসব করিব সে নিশ্চয়ই স্বামীর শত্রু হইবে। যখন পুত্র জন্মিল তখন একজন দাসী ঐ পুত্রটিকে নগরের বাহিরে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। এই সময় রাজা শ্রেণিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কোথায় গিয়াছিল। ঐ দাসীটী সত্য ঘটনা রাজাকে বলিল এবং রাজা অরণ্যে যাইয়া সেই শিশুটিকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে ভৎ´সনা করিলেন। রাজার আদেশে রাণী ঐ পুত্রটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম হইল কৌলিক। এই পুত্র ব্যতীত রাণীর হল্ল এবং বিহল্ল নামে আরও তুইটী পুত্র হইল। একদিন রাত্রে চেলনা নিদ্রাবস্থায় বলিতেছিল "অত্যন্ত শীতে সাধুগণ কতই না কষ্ট পাইতেছে"। এই কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন যে রাণী বোধ হয় কোন লোককে ভালবাসিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে

অভয়কুমারকে রাজঅন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে নগরের বাহিরে মহাবীর অবস্থান করিতেছিলেন এবং শ্রেণিক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। হস্তীশালার নিকটে কতকগুলি পর্ণকুটীরে অভয়কুমার অগ্নি-সংযোগ করিল। শ্রেণিক মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে চেলনার কয়টী স্বামী আছে। ইহার উত্তরে মহাবীর বলেন যে চেলনার একমাত্র স্বামী শ্রেণিক এবং সে সচ্চরিত্রা। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রেণিক প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া অভয়কুমারকে রাজঅন্তঃপুরে অগ্নি সংযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। অভয়-কুমার রাজাকে সত্যঘটনাগুলি বলিলেন এবং ইহার পর চেলনার প্রতি রাজার ভালবাসা অধিকতর হইল। পিতার জীবদ্দশায় রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য কৌলিক অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং সে তাহার পিতাকে কারারুদ্ধ করে। চেলনা কারগারের নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্বামীর দর্শন পাইলেন এবং শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার স্বামী যথাযথ খাদ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অনেক কৌশল করিয়া চেলনা তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত স্বানীর প্রাণরক্ষা করেন। পরে কৌলিক তাহার পিতাকে কারামুক্ত করিয়া ক্ষমাপ্রর্থনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া যখন কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য একটী লৌহদণ্ড সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতেছিলেন, তখন কারাগৃহের রক্ষকগণ শ্রেণিককে বলিল যে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, কারণ কৌলিক নিজে লৌহদণ্ড লইয়া সেখানে আসিতেছেন। শ্রেণিক ভাবিলেন যে

বৈজ্ঞানিকের হস্তে না মরিয়া নিজেই প্রাণনাশ করা বিধেয়। শ্রেণিক বিষ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কৌলিক কারাগৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতার মৃতাবস্থা দেখিলেন। স্বামীর প্রাণনাশে চেলনা অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হইলেন। এই সময়ে মহাবীর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চেলনা অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পার্থিব জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিলেন। আত্মসংযম এবং ধ্যানের বলে তিনি তাঁহার জীবনকে পুণ্যময় করিয়াছিলেন; পরে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

চন্দনবালা

চম্পার রাজা দধিবাহন এবং রাণী ধারিণী প্রজাবর্গের সুখের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের রাজ্যে সুখ-শান্তি ছিল এবং অকালমৃত্যু কেহ জানিত না। রাজকুমারী বসুমতী বিদুষী ছিলেন এবং বীণা-বাদ্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার গভীর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল এবং প্রত্যহ প্রত্যূষে ভগবান জিনেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিতেন। একদিবস যখন রাজা এবং রাণী বংশদেবতাকে পূজা করিতেছিলেন কতকগুলি প্রহরী আসিয়া রাজাকে খবর দিল যে কৌশাম্বীর রাজা শতানিকের সৈন্য তাঁহার রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। রাজা দধিবাহন যুদ্ধের জন্য সৈন্যকে সশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। এই যুদ্ধে রাজা শতানিকের জয় হইল। রাজা দধিবাহন রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। রাজমহিষী ধারিণী এবং কুমারী বসুমতী

রাজ-অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিল। ধারিণী এবং বসুমতী শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইল। মহিষী ধারিণী নিজের জীবন নাশ করেন, এবং কুমারী বসুমতীকে কৌশাম্বী নগরে আনয়ন করা হয়। ধনবাহ নামে একজন শ্রেষ্ঠী বসুমতীকে ক্রয় করিয়া নিজের বাটীতে আনে। ঐ বণিকের মূলা নামে একটী পত্নী ছিল। বসুমতীর দিকে তাহার বিশেষ যত্ন ছিল। বসুমতী ঐ বণিকপত্নীকে পিতামাতার ন্যায় দেখিত। বসুমতী প্রত্যেক লোককে তাহার সুন্দর আচরণের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাহার অপর একটী নাম ছিল চন্দনবালা। মূলার ভয় হইল যে হয়ত যুবতী বসুমতীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠী তাহাকে বিবাহ করিবে। একদিবস বণিক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন ভৃত্যকে দেখিতে পায় নাই। বসুমতী শ্রেষ্ঠীর জন্য জল আনয়ন করিল। যখন সে শ্রেষ্ঠীর পদদ্বয় পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল তখন তাহার কেশগুচ্ছ খুলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ধনবাহ তাহার কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া দেয়। বাটীর দ্বিতল হইতে মূলা ইহা দেখিয়াছিল। যখন ধনবাহ গৃহ হইতে বহির্গত হয় মূলা বসুমতীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহার পাদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাহাকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বন্ধ করিয়া রাখে। ধনবাহ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বসুমতীকে দেখিতে পান নাই। শ্রেষ্ঠী ভাবিলেন বসুমতী কোথাও খেলা করিতেছে। পরে বসুমতী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন যে যদি কেহ তাহার কোন সংবাদ না

দেয় তাহা হইলে প্রত্যেক দাসদাসীকে তিনি বিশেষরূপে শাস্তি দিবেন। পরে একজন বৃদ্ধা নারী শ্রেষ্ঠীর নিকট সমস্ত ব্যাপার বলিল এবং যে ঘরে বসুমতীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে সেই ঘরটা ধনবাহকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠী সেই গৃহে গিয়া বসুমতীকে নবকারমন্ত্র উচ্চারণ করিতে এবং তাহাকে চক্ষু হইতে অনর্গল বারি বর্ষণ করিতে দেখিল। শ্রেষ্ঠী বসুমতীকে রন্ধনশালায় লইয়া গিয়া ভোজনের নিমিত্ত কিছু খাদ্য দিয়া লৌহশৃঙ্খল দূর করিবার জন্য কামার ডাকিতে গিয়াছিলেন। যদিও চন্দনবালা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল তথাপি শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত খাদ্য কোন অতিথিকে না দিয়া ভোজন করে নাই। একজন তাপস মনস্থ করিয়াছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র একজন সতী রাজকুমারীর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবেন। ঐ তাপস চন্দনবালার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পর চন্দনবালা তাহাকে খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাপস স্বয়ং ভগবান মহাবীর—তিনি চন্দনবালার খাদ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ চন্দনবালার লৌহশৃঙ্খল উন্মুক্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং মস্তক সুন্দর কেশে আচ্ছাদিত হইল। শ্রেষ্ঠী চন্দনবালার লুপ্ত সৌন্দর্য্যের পুনরুদ্ধার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীর পত্নী মূলা তাহার কার্য্যে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। রাজা এবং রাজমহিষী চন্দনবালাকে দেখিবার জন্য শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজমহিষী চন্দনবালাকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া যান। চন্দনবালা

মহাবীরের প্রথম এবং প্রধান শিষ্যা বলিয়া পরিচিত। অনেক রাজা ও রাণী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দনবালা বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

নির্ঘণ্ট